



২০০২ সালে মণ্ডিয়লবাসী ক্যানাডিয়ান পরিচালক রেমন্ডে প্রতেনচার যুদ্ধশিশুদের নিয়ে ‘War Babies’ নামে একটি ডকুমেন্টারি তৈরি করেন। সেই ডকুমেন্টারিতে তিনি ওটোরির ওয়াটারলু শহরে বসবাসকারী এক ক্যানাডিয়ান যুবক রায়ানের পিছু নেন। এই যুবক তার অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীতকে ছুঁয়ে দেখার জন্য যাত্রা করেছিল বহু বছর বাস্তু আগে তার জন্ম হওয়া এক অজানা দেশের উদ্দেশ্যে।

বাবা মায়ের গভীর ভালবাসায় জন্ম নেওয়ার সৌভাগ্য রায়ানের হয়নি। প্রেমবিহীন নিষ্ঠুর প্রত্রিয়ায় ভালবাসাহীন প্রথবীতে অনিচ্ছুক এবং অবাধিত আগমন তার। রায়ান একজন যুদ্ধ শিশু। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের করণতম পরিণতি সে। একাত্তর সালে পাকিস্তানি এক সৈনিকের অঙ্গাত কোন বাঞ্ছালি রমণীকে বর্বরভাবে ধর্ষণের পরিণতিতে তার জন্ম। বাহাতুর সালে বাংলাদেশ থেকে তাকে দত্তক নিয়েছিল এক ক্যানাডিয়ান দম্পত্তি। সেখানেই তার বেড়ে উঠে। অতঃপর পরিণত বয়সে নিজের জন্মকালীন সময়কে অনুধাবন করা এবং মাকে খুঁজে পাবার সুতীর আকৃতি থেকে রায়ানের বাংলাদেশ যাত্রা শুরু।

নিজের লেখা এক কবিতায় রায়ান তাঁর নিজের জীবন বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন এভাবে, আমার নাম রায়ান বাদল। আমার দুইজন মা। একজন আমাকে ডাকে রায়ান বলে। আরেকজন আমাকে ডাকতো বাদল বলে। রায়ান বলে যিনি আমাকে ডাকেন, তাকে আমি আমার সারা জীবন ধরে চিনি। কিন্তু যিনি আমাকে বাদল বলে ডাকতেন তাকে আমি কখনো দেখিনি। তিনি আমাকে জন্ম দিয়েছিলেন বাংলাদেশে। সেই জন্মের তিনি সঙ্গাহ পরে আবার আমি জন্মেছিলাম আমার রায়ান নামে ডাকা ক্যানাডিয়ান মায়ের কোলে। বাদল নামে ডাকা আমার জন্মদাত্রী মাকে ১৯৭১ সালে ধর্ষণ করেছিল পাকিস্তানি এক সৈন্য। আমি একজন যুদ্ধ শিশু।

অনেকদিন আগের ঘটনা। তাই নাম ধাম সব ভুলে গিয়েছি আমি। অষ্টাদশী এক তরণী যুদ্ধ-শিশু বুক ভরা আশা নিয়ে ক্যানাড়া থেকে বাংলাদেশে গিয়েছিল তার হারিয়ে যাওয়া মায়ের খোঁজে। তন্ম তন্ম করে খুঁজেও মায়ের হনিস পায়নি সেই তরণী। না দেখা সেই মাকে খোঁজার হনয় বিদারক যন্ত্রণা থেকে মর্মস্পর্শী একটি কবিতা লিখেছিল সে, যা ছাপা হয়েছিল ইংরেজি দৈনিক অবজার্ভারে।

এরও বছর দুয়োক আগে হবে হয়তো ঘটনাটা। কোন এক সাময়িকীর চিঠিপত্র কলামে ছাপা হয়েছিল এক কিশোর যুদ্ধশিশুর চিঠি। বাংলাদেশের কোন এক মদ্দাসার ছাত্র ছিল সে। সেখানে তাকে নিয়দিন ‘জাউরা’, ‘পাকিস্তানির পুতু’সহ নানাবিধ টিচকারি শুনতে হতো সহপাঠীদের কাছ থেকে সেই কিশোর যুদ্ধ-শিশু করণ আর্তিতে জানতে চেয়েছিল, এই দেশে কি তার কোনই অধিকার নেই? সে কি পাকিস্তানি কোন লস্পট ধর্ষক সৈনিকের ঘৃণ্য সত্তান, নাকি এই দেশের স্বাধীনতায় অবদান রাখা এক নির্যাতিতা মায়ের গর্বিত সত্তান? কোন পরিচয়টা তার আসল পরিচয়?

বর্তমানে অঞ্চলিয়ান ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এশিয়ান স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষকতায় নিয়োজিত ডঃ বীনা ডি'কস্টা বিভিন্ন এডোপশন এজেন্সি, বাংলা ওয়েবসাইট এবং সংবাদপত্রে আবেদন জানিয়েছিলেন যুদ্ধশিশুদের সাথে কথা বলার জন্য। খুব অল্প কয়েকজনই তাদের জীবনকাহিনি জনসম্মুখে প্রকাশ করতে আগ্রহী ছিল। বীনা ডি'কস্টাকে লেখা ইমেইলে এক যুদ্ধ-শিশু লিখেছিল,

আমার দত্তক বাবা ছিল মহা বদমাশ এক লোক। সারাক্ষণই আমাকে অপমান করার চেষ্টা করতো সে... আমি বছর চারেক আগে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলাম...আমি সবসময়ই ভাবি যে আমি কেন এই ক্যানাডিয়ান দম্পত্তির কাছে দত্তক হয়েছিলাম। এরা আমাকে দত্তক নেওয়ার তিনমাসের মধ্যেই তাদের বিবাহ-বিচেছেদ ঘটিয়েছিল...আমার শৈশব ছিল

বিভীষিকাময়। আমার যখন খুব প্রয়োজন ছিল তখন আমার নিজের দেশ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে আমার দিক থেকে। আর সে কারণেই আমি বাংলাদেশকে ঘৃণা করি। আমি মাঝে মাঝে গলা ছেড়ে কাঁদি, কারণ আমার কোন শিকড় নেই। একারণেই আমি চেষ্টা করছি যেখানে আমি জন্মেছি সেই দেশ সম্পর্কে কিছুটা জানতে।

অকাল প্রয়াত খ্যাতিমান লেখক মুহাম্মদ জুবায়ের কোন এক যুদ্ধশিশুকে নিয়ে করা হোম ভিডিও দেখার অভিজ্ঞতা থেকে তার নিজের গ্লগে লিখেছিলেন একটি হাদয়স্পর্শী প্রবন্ধ। প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল ‘একটি ভিডিও: ব্যক্তিগত বিজয়ের গল্প’। এই প্রবন্ধে তিনি একজন যুদ্ধশিশুর তার মায়ের সাথে সাক্ষাতের বর্ণনা তুলে ধরেছেন এভাবে।

ভিডিওর শুরুতে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের শহরে মধ্যবিত্ত বাড়ির একটি টেবিলে, ডাইনিং টেবিল বলে ধারণা হয়, দুটি চেয়ারে বসে আছে দু’জন নারী। একজন বয়স্ক, চেহারায়, পোশাকে গ্রামীণ মানুষের ছাপ। কথা বলে বঙ্গড়া শহর বা তৎসংলগ্ন অঞ্চলের ভাষায়। এই মুহূর্তে তার বয়স অনুমান করা যায় না, ধারণা করা যাবে ভিডিও দেখার পরে আনুষঙ্গিক কাহিনীটি জানা হলে। অন্যজন বয়সে তরুণী, মাথাভর্তি কোঁকড় চুলগুলি প্রথমে চোখে পড়ে। রং চেহারায় পুরোপুরি বাঙালি ছাপ থাকলেও কথা বলে মার্কিনি ধৰ্মের ইংরেজিতে। তার পরমের পোশাকটি অবশ্য কোনো তথ্য জানায় না, সূত্রও পাওয়া যায় না। আজকাল বাংলাদেশে শহরের অনেক মেয়েও এ ধরনের পোশাক পরে।
দুই নারী পরম্পরের সঙ্গে কথা বলছে। একজন মহিলা দোভাষী, যাঁকে ক্যামেরায় দেখানো হচ্ছে না, একজনের কথা সাবলীলভাবে অনুবাদ করে জানাচ্ছেন অন্যজনকে। এই কথোপকথন থেকে অবিলম্বে জানা যায়, ইংরেজি-বলা তরঙ্গীটি ওই বয়স্কার কন্যা।

বিবরণের সুবিধার জন্যে এদের একটি

করে কাল্পনিক নাম দেওয়া যাক। আমরা বয়স্কাকে আমিনা এবং তরঙ্গীকে সামিনা নামে চিনবো। তিরিশ বছর পরে, সামিনার জ্ঞানবুদ্ধি হওয়ার পর, এই তাদের প্রথম সাক্ষাত। ভিডিওতে ধরা ছবিতে দেখা যায়, একজন আরেকজনকে ক্রমাগত স্পর্শ করে, অনুভব করার চেষ্টা করে। পরম্পরের অজানা অসম ভাষায় হৃদয়ের যে আর্দ্রতা-ভালোবাসার পূর্ণ প্রকাশ ঘটতে পারে না, স্পর্শে তা সঞ্চারিত হতে থাকে। বস্তুত, প্রথমবারের সাক্ষাতে আজীবনের বিচ্ছেদ ও অদেখার ত্রুণি আর কিছুতেই মেটে না বলে বোধ হয়।

একসময় সামিনা ক্রমাগত চোখের পানি মুছতে থাকলে তার মা বলে ওঠে, ‘ওক্কা করয় চোখ মুছপার থাকলে চোখ বিষ করবি রে মা’। অনুদিত হয়ে কথাটি মেয়ের কাছে পৌঁছুলে কান্নাচোখেই হেসে ফেলে সে, ‘আমার চোখ সত্তিই ব্যথা করছে, মা’। মায়ের মাথায়, কপালে, চুলে, গালে হাত বুলিয়ে মেয়ে একবার হাসে, একবার কেঁদে ওঠে, ‘এতোদিন পর সত্তি তোমার দেখা পেলাম, মা গো! এই দিনের জন্যে আমি অপেক্ষা করেছি আমার সারাটা জীবন ধরে!’ মেয়ের তুলনায় মায়ের আবেগ খানিকটা নিয়ন্ত্রিত মনে হলেও তার চোখও ভিজে ওঠে।

সামিনাকে শিশুকালেই রেডক্সের লোকেরা যুদ্ধশিশু হিসাবে নিয়ে গিয়েছিল আমেরিকায়। সেখানে তাকে দণ্ডক নিয়েছিল আমেরিকান এক পরিবার। বড় হওয়ার পর সে জেনেছে যে সে আসলে একজন যুদ্ধশিশু। আর তখন থেকেই তার শুরু হয় মাত্পরিচয় উদয়াটানের অনুসন্ধান। অক্লান্ত পরিশ্রমে অনেক বছরের চেষ্টার পর মায়ের নাম ঠিকানা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় সে। বার বার খবর পাঠানোর পরেও তার জন্মদাত্রী মা আমিনা রাজি হয়নি মেয়ের সাথে দেখা করার। এমনকি স্থীরান্বিত করেনি পুরো বিষয়টিকে। নাছোড়বান্দা সামিনা শেষমেষে এসে হাজির হয় বাংলাদেশে মাকে এক নজর দেখবার জন্য। তিরিশ বছর পর মুখোমুখি হয় সে তার জন্মদাত্রী মায়ের।

সামিনার মত মাকে ছুঁয়ে দেখার, মায়ের চোখে চোখ রাখার,



মায়ের সাথে কথা বলার সৌভাগ্য বেশিরভাগ যুদ্ধশিশুই হয়নি। তাদের বীরাঙ্গনা মায়েরা যেমন হারিয়ে গেছে আমাদের সমাজের অতল অন্ধকারে, যুদ্ধশিশুরাও তেমনি হারিয়ে গেছে এই বিশাল পৃথিবীর সুবিশাল ব্যক্তিতে। কেউ মনে রাখেনি তাদের কথা। অগণিত দুর্ভাগ্য মা আর তাদের হতভাগ্য সন্তানদের কথা মনে রাখার সময়ই বা কোথায় আমাদের।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে গণধর্ষণের শিকার হয়েছে বাংলি রমণীরা। ঠিক কতজন যে ধর্ষণের শিকার হয়েছে তার সঠিক কোন পরিসংখ্যান আমাদের জানা নেই। বীগা ডিক্সু তার *Bangladesh's erase past* প্রকল্পে জানাচ্ছেন যে, সরকারি হিসাব অনুযায়ী একান্তরে ধর্ষণের শিকার হতে হয়েছিল দুই লক্ষ নারীকে। একটি ইটালিয়ান মেডিক্যাল সার্ভেটে ধর্ষণের শিকার নারীর সংখ্যা বলা হয়েছে চালিশ হাজার। লঙ্ঘনভিত্তিক International Planned Parenthood Federation (IPPF) এই সংখ্যাকে বলেছে দুই লাখ। অন্যদিকে যুদ্ধশিশুদের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সমাজকর্মী ডঃ জিওফ্রে ডেভিসের মতে এই সংখ্যা এর চেয়েও অনেক বেশি। সুজান ক্রাউনমিলারও ধর্ষিতার সংখ্যা চার লাখ বলে উল্লেখ করেছেন।

পাকিস্তান আর্মি যে পরিকল্পিতভাবে বাংলি মহিলা এবং

মেয়েদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ২০০২ সালের মার্চ মাসের বাইশ তারিখে ডন পত্রিকায় প্রকাশিত একটি আর্টিকেল থেকে। যেখানে গণধর্ষণের বিষয়ে ইয়াহিয়া খানের মন্তব্যকে কেট করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট হিসাবে ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালে সরাসরি বাংলাদেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য পাকিস্তান আর্মির নির্দেশ দিয়েছিলেন। যশোরে ছোট একদল সাংবাদিকের সাথে কথা বলার সময় তিনি এয়ারপোর্টের কাছে জড়ো হওয়া একদল বাংলালির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন যে, ‘আগে এদেরকে মুসলমান বানাও’। এই উক্তির তৎপর্য সীমাহীন। এর অর্থ হচ্ছে যে উচ্চ পর্যায়ের সামরিক অফিসারদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে বাংলালিরা খাঁটি মুসলমান নয়। এই ধারণার সাথে আরো দুটো স্টেরিওটাইপ ধারণাও যুক্ত ছিল। বাংলালিরা দেশপ্রেমিক পাকিস্তানি নয় এবং তারা হিন্দু ভারতের সাথে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ।

ইয়াহিয়া খানের এই উক্তিতে উৎসাহিত হয়ে পাকিস্তান আর্মি বাংলাদেশকে মুসলমান বানানোর সুযোগ লুকে নেয়। আর এর জন্য সহজ রাস্তা ছিল বাংলি মেয়েদেরকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে তাদেরকে দিয়ে সাচা মুসলমান বাচ্চা পয়দা করানো। পাকিস্তানি সৈন্য এবং তার এদেশীয় দোসরারা শুধু যত্নত্ব ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি। জোর করে মেয়েদেরকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ধর্ষণ ক্যাম্পে। দিনের পর দিন আটকে রেখে হররোজ ধর্ষণ করা হয়েছে তাদের। পালাতে যাতে না পারে সেজন্য শাড়ী খুলে নগু করে রাখা হতো তাদেরকে। সিলিং এ খুলে আত্মহত্যা যাতে করতে না পারে তার জন্য চুল কেটে রাখা হতো তাদের। পাকিস্তান আর্মির দোসর রাজাকার এবং আলবদরের জনগণকে বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়কে সন্ত্রস্ত করে দেশছাড়া করে তাদের সম্পত্তি এবং জমিজমা দখলের জন্য ধর্ষণকে বেছে নিয়েছিল।

প্রথম আলো ব্লগে আইরিন সুলতানা তার প্রবন্ধ ১৯৭১: *বীরাঙ্গনা অধ্যায় এ সুজান ক্রাউনমিলারের গ্রন্থ Against Our Will: Men, Women and Rape* থেকে অনুবাদ করেছেন এভাবে:

Brownmiller লিখেছিলেন, একান্তরের ধর্ষণ নিছক সৌন্দর্যবোধে প্রলুক্ত হওয়া কোন ঘটনা ছিলনা আদতে; আট বছরের বালিকা থেকে শুরু করে পঁচাতের বছরের নানী-দানীর বয়সী বৃদ্ধাও শিকার হয়েছিল এই গোলুপতার। পাকিস্তানি ঘটনাস্থলেই তাদের পৈশাচিকতা দেখিয়েই ক্ষান্ত হয়নি; প্রতি একশ জনের মধ্যে অন্তত দশ জনকে তাদের ক্যাম্প বা ব্যারাকে নিয়ে যাওয়া হতো সৈন্যদের জন্য। রাতে চলতো আরেক দফা নারকীয়তা।

কেউ কেউ হয়ত আশিরও বেশি সংখ্যক
বার ধর্ষিত হয়েছে ! এই পাশবিক
নিয়াতনে কতজনের মৃত্যু হয়েছে, আর
কতজনকে মেরে ফেলা হয়েছে তার
সঠিক সংখ্যা হয়ত কল্পনাও করা যাবে
না । (Brownmiller, p. 83)

পাকিস্তান আর্মির উচ্চ পদস্থ অফিসাররা যে ব্যাপকহারে
ধর্ষণের ব্যাপারে জানতেন এবং তাদের যে এ ব্যাপারে প্রচলিত
সম্ভিতিও ছিল সেটা বোঝা যায় নিয়াজীর করা এক মন্তব্য
থেকে । নিয়াজী একাত্তরে সংগঠিত ধর্ষণের ঘটনা স্বীকার করার
সাথে সাথে একটি অসংক্ষিপ্ত উচ্চি করেছিলেন - আপনি একেপ
আশা করতে পারেন না যে, সৈন্যরা থাকবে, যুদ্ধ করবে এবং
মুত্তুবরণ করবে পূর্ব পাকিস্তানে আর শারীরবৃত্তীয় চাহিদা নির্বাচিত
করতে যাবে বিলামে !

তবে পাকিস্তান আর্মির পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান স্বীকার করলেও
সম্ভিতিকালে একজন বাঙালি গবেষক ১৯৭১ সালে পাকিস্তান

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কর্ণতম অধ্যায়ের
নাম হচ্ছে বীরাঙ্গনা নারী । যুদ্ধে সকল
পক্ষেরই শত্রুর পাশাপাশি কোথাও না
কোথাও মিত্রও থাকে । কিন্তু এইসব
অসহায় নারীদের মিত্রপক্ষ বলে কিছু
ছিল না । সকলেই ছিল তাদের শত্রুপক্ষ,
তা সে শত্রুই হোক কিম্বা মিত্র
নামধারীরাই হোক । যুদ্ধের সময় নয়মাস
তাদেরকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী, আল
বদর, আল শামস, রাজাকার আর
বিহারিদের কাছে শারীরিকভাবে ধর্ষিত
হতে হয়েছে । আর যুদ্ধের সময় বা পরে
যারা তাদের মিত্র হওয়ার কথা ছিল,
পরম স্নেহে বা ভালবাসায় বুকে টেনে
নেবার কথা ছিল, সেই বাপ-চাচা, ভাই
বেরাদারেরাই তাদেরকে ধর্ষণ করেছে
মানসিকভাবে, আরো কর্ণভাবে, আরো
কর্দর্যরূপে ।

আর্মি কর্তৃক বাঙালি রমণী ধর্ষণকে বিপুলভাবে অতিরিক্ত বলে
উল্লেখ করেছেন । তিনি হচ্ছেন হার্ডি থেকে ডিগ্রিধারী ডঃ
শার্মিলা বসু । তিনি তার *Anatomy of Violence: Analysis of Civil War in East Pakistan in 1971* প্রকাশে এই উন্নত তথ্য প্রকাশ করেন । তার গবেষণা
কর্ম ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি করে এবং অনেকেই তার
গবেষণার পদ্ধতিকে অগভীর, ত্রুটিপূর্ণ এবং পক্ষপাতপূর্ণ বলে
পালটা আক্রমণ করতেও দিখা করেননি । অধ্যাপক মুনতাসীর
মামুন শার্মিলা বসুর গবেষণার সমালোচনা করে দৈনিক
সমকালে একটি প্রবন্ধ লিখেন বাঙালি রমণীর পাকিস্তান সৈন্য
প্রীতি নামে । নয়নিকা মুখাজ্জীও ওই প্রবন্ধকে সমালোচনা করে
প্রবন্ধ লিখেছেন *Skewing the history of rape in 1971: A prescription for reconciliation?* নামে ।
এর বাংলা অনুবাদ করেছেন তানভীর, যা প্রকাশিত হয়েছে
মুক্তমনাতেই ।

কতজন ধর্ষিতা নারী গর্ভবতী হয়েছিলেন এবং কতজন শিশু
জন্মগ্রহণ করেছিল তা পুরোপুরি অনিশ্চিত । সামাজিক
অপবাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য অনেক মা-ই সেই সময়
করেছিলেন আত্মহত্যা । অসংখ্য গর্ভবতী মহিলা চলে
গিয়েছিলেন ভারতে বা অন্য কোথাও গোপনে সত্তান জন্ম
দেওয়ার জন্য । অনেক শিশু জন্মেছিল ঘরে দাইয়ের হাতে,
যার কোন রেকর্ড নেই । দুঃখজনক হচ্ছে যে নির্ভরযোগ্য এবং
ত্রুটিহীন কোন পরিসংখ্যানই নেই আমাদের হাতে । ফলে,
যুদ্ধশিশুর সংখ্যা কত ছিল তার জন্য আমাদেরকে নির্ভর করতে
হয় মূলত অনুমান এবং ধারণার উপর । সামান্য কিছু দলিলপত্র
ছাড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সরকারি এবং বেসরকারি সংগঠনের
কাছে । কিছু কিছু আছে বিদেশি মিশন এবং মিশনারি
সংস্থাগুলোর কাছে ।

সরকারি এক হিসাবে জন্মগ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা বলা হয়েছে
তিনি লাখ । কিন্তু সেই পরিসংখ্যারের পদ্ধতি ছিল ত্রুটিপূর্ণ । ডঃ
ডেভিসের মতে প্রায় দুই লক্ষ রমণী গর্ভবতী হয়েছিলেন । কিন্তু
এই সংখ্যা সম্পূর্ণ অনুমানের ভিত্তিতে করা, কোন গবেষণা
থেকে প্রাপ্ত নয় । সাংবাদিক ফারক ওয়াসিফ তার সেইসব
বীরাঙ্গনা ও তাদের না পাক শরীর' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন:

ধর্ষণের পরও বেঁচে থাকা নারীদের মধ্যে
২৫ হাজার জন গর্ভধারন করেছিলেন
বলে জানা যায় (রাউনমিলার, ১৯৭৫ :
৮৪) । ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইভিংস
কমিটির পুরোধা এমএ হাসান দাবি
করেন, 'এ ধরনের নারীর সংখ্যা ছিল
কমপক্ষে ৮৮ হাজার ২ শ' । '৭২
সালের মার্চ পর্যন্ত ১ লাখ ৬২ হাজার
ধর্ষিত নারী এবং আরো ১ লাখ ৩১

হাজার হিন্দু নারী স্মেরণ গায়ের হয়ে গিয়েছিল। তারা বিলীন হয়ে গিয়েছিল বিশাল জনসমূহে।’ এদের মধ্যে ৫ হাজার জনের গর্ভপাত সরকারিভাবে ঘটানো হয়েছিল বলে জানান আন্তর্জাতিক প্লানড ফাদারহৃত্য প্রতিষ্ঠানের ড. জিওফ্রে ডেভিস। যুদ্ধের পরপরই তিনি এসব মা ও তাদের শিশুদের সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশে আসেন। ১৯৭২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি তার কাজের ওপর একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন তৎকালীন দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত হয়েছিল। তার মতে, সরকার উদ্যোগ নেওয়ার আগেই ১ লাখ ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার নারীর ভূগ স্থানীয় দাই, ক্লিনিকসহ যার পরিবার যেভাবে পেরেছে সেভাবে ‘নষ্ট’ করেছে।

ডঃ এম এ হাসান তার প্রবন্ধ *The Rape of 1971: The Dark Phase of History'* তে বলেন যে সারা দেশের গর্ভপাত কেন্দ্র এবং হাসপাতালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দশ শতাংশের চেয়েও কম সংখ্যক ধর্ষিতা সেগুলোতে ভর্তি হয়েছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘরেই গর্ভপাতগুলো ঘটানো হয়েছে এবং সামাজিক পরিস্থিতির কারণে তা গোপন রাখা হয়েছে। এ ছাড়া যে সমস্ত মহিলা সেপ্টেম্বরের পরে গর্ভবতী হয়েছেন বা ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে যাদের গর্ভবস্থা ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে তারা কেউই গর্ভপাত কেন্দ্র বা হাসপাতালে যাননি।

বাংলাদেশ সরকার এবং জাতিসংঘের আহবানে সাড়া দিয়ে ধর্ষিতা মহিলাদের গর্ভপাতের জন্য ঢাকায় পৌছায় ব্রিটিশ, আমেরিকান এবং অঞ্চলিয়ান ডাক্তাররা। তাঁরা বাংলাদেশে পৌছার পরেই প্রতিষ্ঠা করা হয় বেশ কিছু গর্ভপাত কেন্দ্র।। এই গর্ভপাত কেন্দ্রগুলো সেবাসদন নামে পরিচিত ছিল। সেখানে তারা বাংলাদেশি ডাক্তারদের সহযোগিতায় গভৰ্পাত করানো শুরু করেন। সেই সময়কার সংবাদপত্রের ভাষ্য এবং বিভিন্ন ব্যক্তি যেমন বিচারপতি কে, এম, সোবহান, মিশনারিজ অব চারিটির সুপারভাইজর মার্গারেট মেরি, ডঃ জিওফ্রে ডেভিসের সাক্ষাত্কার থেকে জানা যায় যে ঢাকার বিভিন্ন ক্লিনিকে দুই হাজার তিন শত গর্ভপাত করানো হয়েছিল।

সারাদেশব্যাপী গড়ে তোলা বাইশটি সেবাসদনে প্রতিদিন তিনশ থেকে চারশ শিশু জন্ম নিতো। ক্যানাডিয়ান ইউনিসেফ কমিটির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর যুদ্ধ পূর্ব এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন। রেডক্রস প্রতিনিধি এবং

ইউনিসেফের লোকজনের সংগে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি অটোয়ার মূল অফিসে জানান যে বাংলাদেশে জন্ম নেওয়া যুদ্ধশিশুর সংখ্যা আনুমানিক প্রায় দশ হাজার। সুজান ব্রাউনমিলারের মতে সস্তান জন্ম দিয়েছিল এমন বীরাঙ্গনার সংখ্যা হবে পঁচিশ হাজার।

বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতায় সেই সময় এই শিশুরা সমাজে তৈরি করে ভয়াবহ সংকট এবং সমস্যা। কেউ কেউ এই শিশুদেরকে বলে ‘অবাধিত সস্তান’, কেউ বলে ‘অবৈধ সস্তান’, কেউ বলে ‘শত্রু শিশু’ আবার কেউ বা নিদারণ স্থানে উচ্চারণ করে ‘জারজ সস্তান’ বলে। ফলে, এই সংকট থেকে কী করে মুক্তি পাওয়া যায় সেটাই হয়ে উঠে সেই সময়কার আঙ চিন্তার বিষয়। সেই চিন্তা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়কেও ছুঁয়েছিল। শেখ মুজিব ধর্ষিতা নারীদেরকে বীরাঙ্গনা উপাধিতে ভূষিত এবং তাদেরকে নিজের মেয়ে হিসাবে উল্লেখ করলেও সেই মেয়েদের সস্তানদের ব্যাপারে তার কোন অগ্রহই ছিল না। তিনি পরিক্ষারভাবে বলে দেন যে পাকিস্তানিদের রক্ত শরীরে আছে এমন কোন শিশুকেই বাংলাদেশে থাকতে দেওয়া হবে না। যুদ্ধশিশুদের বিষয়ে নীলিমা ইরাহিম তার সংগে দেখা করতে গেলেও তিনি একথাই বলেন। এ বিষয়ে ফারুক ওয়াসিফ লিখেছেন:

‘যুদ্ধশিশু’ এবং তাদের মাদের একটা সুব্যবস্থা করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নীলিমা ইরাহিম অনেক খেটেছিলেন। এদের ভাগ্যে কী হবে, তা জানতে তিনি শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি তাকে বলেন, ‘না আপা। আপনি দয়া করে পিতৃপরিচয়ীন শিশুদের বাইরে (বিদেশে) পাঠিয়ে দেন। তাদের সম্মানের সঙ্গে মানুষের মতো বড় হতে দিতে হবে। তাছাড়া আমি এসব নষ্ট রক্ত দেশে রাখতে চাই না’। (ইরাহিম, ১৯৯৮ : ১৮)। এটি কেবল রাষ্ট্রের স্ফুর্তি এক মহানায়কের সংকট নয়, এটা ছিল জাতীয় সংকট। গোটা জাতির হাদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল, গ্লানি জমছিল।

শেখ মুজিবের এই বক্তব্যই হয়তো যুদ্ধশিশুদেরকে দন্তকের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আইনে তখন বাংলাদেশ কোন শিশুকে ভিন্নদেশে দন্তক দেওয়ার বিধান ছিল না, যদিও বাংলাদেশ পিতামাতা দন্তক সস্তান নিতে পারতেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত অনুরোধে জেনেভাভিত্তিক International Social Service (ISS/AB) এর



ইউএস ক্রান্তি সর্বপ্রথম এগিয়ে আসে যুদ্ধশিশুদের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য। সরকারি দু'টি সংগঠন Central-Organization for Women এবং Rehabilitation and Family Planning Association কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে কাজ করতে থাকে ISS এর পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের পুরো পর্যায় জুড়ে। বিদেশি নাগরিকরা যাতে সহজেই যুদ্ধশিশুদের দন্তক নিতে পারেন সে জন্য ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশে প্রজ্ঞাপিত হয় The Bangladesh Abandoned Children (Special Provisions) Order। বাংলাদেশ থেকে যুদ্ধ শিশুদের দন্তক নেওয়ার ব্যাপারে সর্বপ্রথম যে দেশগুলো অগ্রহ দেখায় তাদের মধ্যে ক্যানাডা অন্যতম। মাদার তেরেসা এবং তার সহকর্মীদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা এবং বাংলাদেশ সরকারের শ্রম এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চেষ্টায় দুটো ক্যানাডিয়ান সংগঠন দন্তক প্রক্রিয়ার অংশ নেয়। এর মধ্যে একটি ছিল মন্ট্রিয়ল ভিত্তিক অলাভজনক আন্তঃদেশিয় দন্তক প্রতিষ্ঠান Families for Children এবং অন্যটি ছিল একদল উৎসাহী ক্যানাডিয়ানের গড়া ট্রান্সোভিটিক অলাভজনক দন্তক প্রতিষ্ঠান Kuan-Yin Foundation। ক্যানাডা ছাড়াও আর যেসব দেশ এগিয়ে এসেছিল যুদ্ধশিশুদের দন্তক নিতে সেগুলো হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, মের্দোরল্যান্ড, সুইডেন এবং অস্ট্রেলিয়া। এছাড়াও আরো অনেক আন্তর্জাতিক

সংস্থাও এগিয়ে এসেছিল সেই সময়। যুদ্ধশিশুদের প্রথম ব্যাচ ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে ক্যানাডায় পৌঁছলে তা মিডিয়ার ব্যাপক মনযোগ আকর্ষণ করে।

আর এভাবেই রাষ্ট্র এবং সমাজের ইচ্ছা এবং প্রচেষ্টায় আমাদের সন্তানেরাই মাত্তুরূপ পান করার বয়সে মাত্কোল ছেড়ে চলে যেতে থাকে আজানা দেশে, অচেনা মানুষজনের কাছে। এই চরম অমানবিক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মত সবল কোন মানবিক শক্তি তখন ছিল না। মজার বিষয় হচ্ছে যে, নীলিমা ইব্রাহিম এক সাক্ষাত্কারে জানিয়েছেন, মোল্লারাই বরং শুরুর দিকে এই দন্তক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সোচার ছিল। মোল্লাদের বিরোধিতার মূল কারণ অবশ্য ছিল এই যে এই সমস্ত মুসলমান সন্তানদেরকে খ্রিস্টান দেশসমূহে পাঠানো হচ্ছে। ফলে তারা খ্রিস্টান হয়ে যাবে।

গীতা দাস তার মুক্তমনায় প্রকাশিত ‘তখন ও এখন’ ধারাবাহিকের ২৪তম পর্বে পাকিস্তান আর্মি কর্তৃক নির্যাতিত তার কিশোরি মাসি প্রমীলার করণ পরিগতির কথা বর্ণনা করেছেন। সেই লেখায় আমি একটি দীর্ঘ মন্তব্য করেছিলাম। প্রাসঙ্গিক বিধায় সেই মন্তব্যটি এখানে তুলে দিচ্ছি।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের করণতম অধ্যায়ের নাম হচ্ছে বীরাঙ্গনা নারী। যুদ্ধে সকল পক্ষেরই শত্রুর পাশাপাশি কোথাও না কোথাও মিত্রও থাকে। কিন্তু এইসব অসহায় নারীদের মিত্রপক্ষ বলে কিছু ছিল না। সকলেই ছিল তাদের শত্রুপক্ষ, তা সে শত্রুই হোক কিম্বা মিত্র নামধারীরাই হোক। যুদ্ধের সময় নয়মাস তাদেরকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী, আল বদর, আল শামস, রাজাকার আর বিহারিদের কাছে শারীরিকভাবে ধর্ষিত হতে হয়েছে। আর যুদ্ধের সময় বা পরে যারা তাদের মিত্র হওয়ার কথা ছিল, পরম স্নেহে বা ভালবাসায় বুকে টেনে নেবার কথা ছিল, সেই বাপ-চাচা, ভাই বেরাদারেরাই তাদেরকে ধর্ষণ করেছে মানসিকভাবে, আরো করণভাবে, আরো কদর্যকৃতে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বীরাঙ্গনাদেরকে তাচ্ছল্য করে এর কাছাকাছি উচ্চারণের চরম অবমাননাকর একটা নামেও ডেকেছে অনেকে। আমি একে বলি সামাজিক ধর্ষণ। সামাজিক এই ধর্ষণ শারীরিক ধর্ষণের চেয়ে কম কিছু ছিল না বীরাঙ্গনাদের জন্য।

ଆମାଦେରଇ କାରଣେ ସେ ପକ୍ଷେ ତାଦେରକେ ପତିତ ହତେ ହେଯେଛିଲ ଅନିଚ୍ଛୁକଭାବେ, ମମତା ମାଥାନୋ ହାତ ଦିଯେ ତାଁଦେର ଗା ଥେକେ ସେଇ ପକ୍ଷ ସାଫ୍ଟ୍‌ସୁତରୋ କରାର ବଦଳେ ନିଦାରଳ୍ଗ ସାର୍ଥପରତା ଏବଂ ହିଂସତାର ସାଥେ ଆମରା ତାଁଦେରକେ ଠେଲେ ଦିଯେଛିଲାମ ଆରୋ ଗଭିର ପକ୍ଷର ମାରୋ । ପାହେ ନା ଆବାର ଗାୟେ କାଦା ଲେଗେ ଅଶ୍ଵଦ୍ଧ ହୟ ଆମାଦେର ଏହି ବିଶ୍ଵଦ୍ଵ ସମାଜ । ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ସେ ଗର୍ଭବସ୍ଥା ତାଁର ପେମେଛିଲେନ ଶତ୍ରୁର କାହୁ ଥେକେ, ସମାଜେର ରଙ୍ଗଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ସୃଗାର କାରଣେ ତା ଲୁକାନୋଟାଇ ଛିଲ ସେଇ ସମୟ ସବଚେଯେ ବେଶି ଜରକୀ କାଜ । ସମାଜକେ ବିଶ୍ଵଦ୍ଵ ରାଖତେ ତାଁଦେର କେଉ କେଉ ଗର୍ଭନାଶ କରେଛେ ନୀରବେ, କେଉ କେଉ ଆବାର ନିଜେର ଜୀବନନାଶ କରେଛେ ସଂଗୋପନେ । ଆର ଯାରା ତା ପାରେନନି, ତାଁର ଲୋକଚକ୍ଷୁର ଅନ୍ତରାଳେ ସତାନ ଜନ୍ମ ଦିଯେ ଚଲେ ଗେଛେ ଅଜାନାର ପଥେ । ଜନ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତେଇ ଚିରତରେ ଛିନ୍ନ ହେଁ ଗେଛେ ମା ଆର ତାର ସତାନେର ନାଡ଼ୀର ଟାନ ଦେବଶିଶୁର ମତ ସେଇ ସବ ଯୁଦ୍ଧଶିଶୁରାଓ ଏଥିନ କେ କୋଥାଯ ଆଛେ ତାର କିଛୁଇ ଜାନି ନା ଆମରା । ଏଇ ଦାୟଭାର କାର? ଆମାଦେର ଏହି ସମାଜେର ନୟ କି?

ଆମାଦେର ଉପର ଅତ୍ୟାଚାର ନିର୍ଯ୍ୟାତନେର ଜନ୍ୟ, ଗଣହତ୍ୟା ଚାଲାନେର ଜନ୍ୟ ଆମରା ପାକିସ୍ତାନେର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାବି କରି । ଆମରା ନିଜେରାଇ କି ଆମାଦେର ସେଇସବ ବୀରାଙ୍ଗନ ଏବଂ ତାଁଦେର ସଦ୍ୟଜାତ ସନ୍ତାନଦେର ଉପର ସେ ଚରମ ଅବିଚାର କରେଛି, ସେ ନୀତିହିନୀ ନିଷ୍ଠୁରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେଛି ତାର ଜନ୍ୟ କ୍ଷମା ଚେଯେଛି କଥନୋ? ଚାଇନି । ଚାଇନି ବଲେଇ ସେ ଚାଓୟା ଯାବେ ନା ଏମନ କୋନ କଥା ନେଇ । ଏଥିନ ସମୟ ଏସେହେ ସେଇ ସବ ବୀର ନାରୀଦେର ଏବଂ ତାଁଦେର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୁଦ୍ଧଶିଶୁଦେର କାହେ ଜାତିଗତଭାବେଇ ଆମାଦେର କରଜୋଡ଼େ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରା । ଏହି ବିଜୟ ଦିବସେ ସେଇ ଅଞ୍ଚିକାରଟୁକୁଇ ବା ଆମରା କରି ନା କେନ?

ଦେଶ ସ୍ଵାଧୀନ ହେଁ ପରେଇ ପରିବାରେ ସମ୍ମାନେର କଥା ଭେବେଇ ନିଜେଦେରକେ ଲୁକିଯେ ଫେଲେଛିଲେନ ବୀରାଙ୍ଗନ ନାରୀରା । ଏହି ନିଷ୍ଠୁର

ସମାଜକେ ବିଶ୍ଵଦ୍ଵ ରାଖତେ
ତାଁଦେର କେଉ କେଉ ଗର୍ଭନାଶ କରେଛେ
ନୀରବେ, କେଉ କେଉ ଆବାର
ନିଜେର ଜୀବନନାଶ କରେଛେ
ସଂଗୋପନେ । ଆର ଯାରା ତା ପାରେନନି,
ତାଁର ଲୋକଚକ୍ଷୁର ଅନ୍ତରାଳେ
ସତାନ ଜନ୍ମ ଦିଯେ ଚଲେ ଗେଛେ ଅଜାନାର
ପଥେ । ଜନ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତେଇ ଚିରତରେ ଛିନ୍ନ ହେଁ
ଗେଛେ ମା ଆର ତାର ସତାନେର ନାଡ଼ୀର
ଟାନ ଦେବଶିଶୁର ମତ ସେଇ ସବ
ଯୁଦ୍ଧଶିଶୁରାଓ ଏଥିନ କେ କୋଥାଯ ଆଛେ
ତାର କିଛୁଇ ଜାନି ନା ଆମରା । ଏଇ
ଦାୟଭାର କାର? ଆମାଦେର ଏହି
ସମାଜେର ନୟ କି?

ସମାଜେର କାହେ କୋନ ଚାଓୟା-ପାଓୟା ଛିଲ ନା ତାଁଦେର । ନିୟତିର କାହେ ସଂପେ ଦିଯେଛିଲେନ ତାଁର ନିଜେଦେରକେ । ଏକାତରେ ସେ ଦୁଃସହ ଅବହ୍ଲାଶ ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଯେତେ ହେଁବେ ତାଁଦେରକେ ତାର ଯାତନା ଭୁଲେ ଥାକା ରୀତିମତ ଅସାଧ୍ୟ ଛିଲ ତାଁଦେର ଜନ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ନିଜେର ସମାଜ ତାଁଦେରକେ ଗ୍ରହଣ କରେନି ସହଜଭାବେ । ବୀରାଙ୍ଗନ ନାମେର ଉପାଧି ତାଁଦେର ସମ୍ମାନେର ଚେଯେ ଅସମ୍ମାନ ହେଁ ଏସେଛିଲ ବେଶ । କୋନ କିଛିର ପ୍ରତ୍ୟାଶାଇ ତାରା ଆର କରେନି ଆମାଦେର କାହୁ ଥେକେ । ତାରପରାଓ କି କୋନ ଏକ ଦୁର୍ବଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମନେର ଗହିନ କୋଣେ କୋନ ଆଶା ବିଲିକ ଦିଯେ ଉଠେନି ତାଁଦେର ମନେ । ଆଶା କୀ ଜାଗେନି ସେ ସେ ଦେଶେର ଜନ୍ୟ ତାରା ଏତୋ ଅପମାନ ଆର ସନ୍ତ୍ରଣା ସରେଛେ ସେଇ ଦେଶେର କେଉ ଏକଜନ ସାମାନ୍ୟ ଏକଟୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାବେ ତାଁଦେର । ସାମାନ୍ୟ ଏକଟୁ ମମତା ଦିଯେ ଜାନତେ ଚାଇବେ ତାଁଦେର ସୁଖ-ଦୁଃଖରେ କାହିନି । ନୀଲିମା ଇରାହିମେର ଆମି ବୀରାଙ୍ଗନା ବଲଛି ଗ୍ରହେ ବୀରାଙ୍ଗନ ନାରୀ ତାର ଆକଞ୍ଚକା ପ୍ରକାଶ କରେଛେ ଏଭାବେ:

ଏକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଆକଞ୍ଚକା ମୃତ୍ୟୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ
ପର୍ୟନ୍ତ ରଖେ ଯାବେ । ଏ ପ୍ରଜନ୍ୟେ ଏକଟି
ତରଳ ଅଥବା ତରଣୀ ଏସେ ଆମର ସାମନେ
ଦାଁଡ଼ିଯେ ବଲବେ, ବୀରାଙ୍ଗନ ଆମରା
ତୋମାକେ ପ୍ରଗତି କରି, ହାଜାର ସାଲାମ

তোমাকে। তুমি বীর মুক্তিযোদ্ধা, ঐ
পতাকায় তোমার অংশ আছে। জাতীয়
সংগীতে তোমার কর্তৃ আছে। এদেশের
মাটিতে তোমার অগ্রাধিকার। সেই শুভ
মুহূর্তের আশায় বিবেকের জাগরণ
মুহূর্তে পথ চেয়ে আমি বেঁচে রইবো।

যে যুদ্ধশিশুদেরকে আমরা আমাদের সমাজের শুদ্ধতা বজায়
রাখার জন্য বিতাড়িত করেছিলাম দেশ থেকে তারা কিন্তু
বাংলাদেশেরই সন্তান। শুধু সন্তানই নয়, এই দেশের রক্তাক্ত
জন্ম প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশও তারা। চোখ বন্ধ করে যতই
আমরা তা অস্বীকার করি না কেন, বিবেক নামক কোন কিছুর
যদি সামান্যতম অস্তিত্ব আমাদের থেকে থাকে, তবে সেখানে
ঠিকই কিছুটা হলে রক্তক্ষরণ হওয়ার কথা। যদি কোনদিন ওই
সমস্ত যুদ্ধশিশুরা করণ গলায় জিজ্ঞেস করে, ‘বলো, কী
আমাদের অন্যায় ছিল, যার জন্য তোমরা আমাদেরকে মায়ের
কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়েছো জন্ম মুহূর্তেই। বিখিত করেছো
আমাদেরকে মাত্স্নেহ থেকে সারা জীবনের জন্য। এমনকি
অপরিসীম ঘৃণায় দেশ থেকেও বিতাড়িত করেছো চিরতরে,
আমরা কিছু বোঝার আগেই। আর সে কারণে আজ আমাদের
কোন শিকড় নেই। নেই কোন মরতা মাখানো হাত দুঃসময়ে
বুকে টেনে নেওয়ার জন্য। নেই কোন জন্মভূমি, যাকে আমরা
ভালবাসতে পারি প্রাণ ভরে। আমাদের জীবনকে এরকম
দুঃসহ, ছন্দছাড়া আর লঙ্ঘণশুল্ক করে দেবার অধিকার
তোমাদেরকে কে দিয়েছিল? আমাদের জন্মগত অধিকারকে
কেন তোমরা কেড়ে নিয়েছিলে নির্ভূরভাবে?

এর কি কোন জবাব আছে আমাদের কাছে?

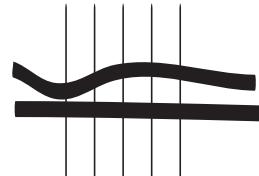
জানি কোন জবাব নেই আমাদের। যে-অন্যায় এবং -অবিচার
আমরা করেছি উনচল্লিশ বছর আগে তার প্রায়শিক্তি এবং
পাপমোচনের সময় এসে গেছে। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির
এখন উচিত তার তাড়িয়ে দেওয়া, হারিয়ে যাওয়া হতভাগ্য
যুদ্ধ শিশুদের কাছে নতজানু হয়ে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করা।
কর্তকর্মের জন্য অনুতপ্ত হওয়া। পূর্ণ মর্যাদায় তাদেরকে রাষ্ট্রীয়
স্বীকৃতি প্রদান করা। গভীর ভালবাসা দিয়ে বলা, তোমরা
আমাদেরই সন্তান, আমাদেরই আপনজন। এই দেশ
তোমাদেরই দেশ। কারো চেয়ে এক বিন্দু কম অধিকার নয়
তোমাদের এই মাটিতে।

আমুন, বীরাঙ্গনা নারী এবং যুদ্ধশিশুদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনার
মিছিলে সমবেত হই আমরা সবাই। অতীতের পাপমোচনের
দায়ভার যে আমাদের সকলেরই।

নির্ভর করেছি আমি। অনিঃশেষ
কৃতজ্ঞতা রাইলো সেজন্য। সেই সাথে
অন্য যাদেও লেখা থেকে তথ্য ব্যবহার
করেছি তাদের প্রতিও আমার সবিশেষ
কৃতজ্ঞতা।

একজনের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার
কারণে লিখিত এই প্রবন্ধটি। বাহ্যিক
বিধায় তাঁর নামটি উহ্য রাখা হলো।
অন্তরালের সেই বিশেষ একজনের
উদ্দেশেই নির্বেদিত আমার এই
(লেখাটি।)

ফরিদ আহমেদ, মুক্তমনা ব্লগের
মডারেটর এবং লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ -
‘মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে’ (অভিজিৎ রায়ের সাথে মিলে); অবসর,
২০০৭



(এই লেখাটির জন্য বীণা ডি'কস্টার
লিখিত বীরাঙ্গনা নারী এবং যুদ্ধশিশু
বিষয়ক প্রবন্ধসমূহের উপর ব্যাপকভাবে